মাহ্মূদ সামী আল-বারূদী

(১২৫৫ - ১৩২২ হি. = ১৮৩৯ - ১৯০৪ খ্রি.)

জন্ম ও বংশঃ

আধুনিক আরবী কবিতায় নবজাগরণের পথিকৃৎ কবি মাহ্মূদ সামী আল-বারূদী (مَحْمُوْد سَامِي البَارُوْدِي) ১২৫৫ হিজরীর ২৭ শে রজব মোতাবেক ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের[1] ৬ ই অক্টোবর মিসরের রাজধানী কায়রোর এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

তার জনক হাসান হাসানী বেক ও জননী উভয়েই ককেশীয় (جركسي) বংশোদ্ভূত ছিলেন। মিসরের শাসক মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে (১৮০৫-১৮৪৮) তাঁর পিতা একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ছিলেন। এরপর মুহাম্মদ আলী কর্তৃক সুদান বিজিত হলে তিনি কবির পিতাকে সেখানের বারবার ও দানকোলা (بربرو دنقلة, Dongola) প্রদেশের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করেন।[2] জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি দানকোলাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ককেশীয় বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ বেক কবির পিতামহ (দাদা) ছিলেন। বংশ পরম্পরায় তাঁরা সরকারি কর (ملتزم) আদায়ের কাজ করতেন।[3] তাঁর এক প্রপিতামহ বুহায়রা (البحيرة) প্রদেশের একটি শহর ঈতায়া আল-বারূদের (إيتاي البارود) গভর্নর (মুলতাযিম) ছিলেন। সেই

অঞ্চলের দিকে সম্পর্কিত করেই তাদের নামের সঙ্গে 'আল-বারূদী' শব্দটি যুক্ত হয়।[1] কবির বংশ পরম্পরা মিসরের মামলূকী সুলতান বারসবাই আতাবেকীর (برسباي الأتابكي) ভাই নাওরূয আতাবেকীর (نوروز الأتابكي) সঙ্গে মিলিত হয়।[2] কবি বারূদী তাঁর এই বংশ আভিজাত্য নিয়ে প্রায়শই গর্ব করতেন।[3]

শিক্ষা ও শৈশবঃ

কবির প্রাথমিক শিক্ষা স্বগৃহেই শুরু হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাত বছর বয়সে আকস্মিক কবির পিতৃ-বিয়োগ ঘটে।[4] অতঃপর তাঁর নিকটাত্মীয়রা কবির শিক্ষা-দীক্ষা তথা প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি আট থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের গৃহেই পড়াশোনা করেন।[5] ১৮৫১ সালে, তাঁর বয়স যখন বারো বছর, তিনি অন্যান্য ককেশীয় ও তুর্কী শাসক শ্রেণির ছেলেদের সঙ্গে কায়রোর মিলিটারি ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন।[6] এরপর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে, ষোলো বছর বয়সে, মহম্মদ আলীর পুত্র প্রথম আব্বাস হিল্‌মীর শাসনামলে (১৮৪৮-১৮৫৪) একজন সেনা অফিসার (باشجاويش, Quartermaster-sergeant) হিসাবে স্নাতক হন।[7]

কর্ম জীবনঃ

এদিকে প্রথম আব্বাস হিল্‌মী পাশা (عباس حلمي باشا الأول) এবং তাঁর উত্তরসূরি মুহাম্মদ সায়ীদ পাশার (محمد سعيد باشا) শাসনামলে (১৮৫৪-১৮৬৩) মিসরের সামরিক তৎপরতায় ভাঁটা আসে। ফলে বারূদী তাৎক্ষণিকভাবে কোন চাকরি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু অলস ভাবে সময় অতিবাহিত না করে তিনি কাব্যচর্চায়

মনোনিবেশ করেন। তিনি জাহিলী, উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগের স্বনামধন্য কবিদের কবিতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী বারূদী এই ভাবে আরবী কাব্য-ভাণ্ডারের এক বৃহৎ অংশ মুখস্থ করে ফেলেন। ফলে তাঁর ভাষা শুদ্ধ ও পরিণত হয়ে যায় এবং ব্যাকরণ পাঠ না করেই তাতে তিনি নির্ভুল হয়ে ওঠেন।[1] তখন থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক কবিতার প্লাবনে প্লাবিত হয়ে যায় এবং তাঁর কলম হতে কবিতার প্রস্রবণ ফল্গুধারার মত ছুটতে থাকে।

অতঃপর ১৮৫৫ সালে তিনি খিলাফতের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) যাত্রা করেন এবং মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[2] ইস্তানবুলের সমৃদ্ধ লাইব্রেরীগুলি তাঁর সাহিত্য পিপাসা নিবারণের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে আব্বাসী যুগ পর্যন্ত কবিতার বিশাল সমুদ্রে ডুব দেন এবং প্রয়োজনীয় মনি-মুক্তা সংগ্রহ করেন। এছাড়া ফারসী ও তুর্কী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এমনকী আরবীর সাথে সাথে এই দুই ভাষাতেও কবিতা রচনা করেন।[3]

এদিকে ১৮৬৩ সালে সায়ীদের উত্তরসূরি হয়ে ইসমা'ঈল পাশা মিসরের তখ্তে আসীন হন (বড়োলাট, ১৮৬৩-১৮৭৯)। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ইস্তাম্বুল ছুটে যান ওসমানিয়া খিলাফতের শুকরিয়া আদায় ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে।[4] রাজধানী ইস্তাম্বুলে কর্মরত উচ্চাকাঙ্ক্ষী[5] বারূদী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কালক্রমে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বারূদীর সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়। তিনি কবিকে মিসরে নিয়ে আসেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ব্যাটেলিয়ন

কমান্ডার (بكباشي, Binbashi) পদে উন্নীত হয়ে রাজপ্রতিনিধির রক্ষীবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন।[1]

স্বল্পকাল পরেই ফরাসি সেনাবাহিনীর বাৎসরিক কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে তিনি মিসরীয় সেনা অফিসারদের সঙ্গে ফ্রান্স গমন করেন। সেখান থেকে ব্রিটিশদের সামরিক ব্যবস্থাপনা দেখতে লন্ডন যান।[2] ১৮৬৪ সালে মিশরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি রক্ষীবাহিনীর তৃতীয় রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট কর্নেল (قائمقام, Lieutenant-Colonel) পদে উন্নীত হন। এর স্বল্পকাল পরেই চতুর্থ রেজিমেন্টের কর্নেল (أمير آلاي, Colonel) হয়ে যান।[3]

রণাঙ্গনেঃ

১৮৬৬ সালে উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের ক্রিট (Crete, كريت) দ্বীপে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে কবিকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে প্রেরণ করা হয়।[4] তিনি এখানে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। ফলস্বরূপ সুলতান তাঁকে উসমানী পদক (الوِسَامُ العُثْمَانِي) দ্বারা সম্মানিত করেন। এসময় রণাঙ্গনের চিত্রাঙ্কন করে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'নূনিয়্যা' কবিতাটি সহ একাধিক কবিতা রচনা করেন। নতুন স্টাইলে রচিত তাঁর এই কাব্য পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে ও চরম সমাদৃত হয়। বিদ্রোহ দমনের পরবর্তী বারো বছর তিনি কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

এদিকে খেদিভ ইসমা'ঈল তাঁকে রক্ষীবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেন। এরপর তিনি বারূদীকে ব্যক্তিগত সচিব (كَاتِمُ السِّرّ, Private Secretary) নিয়োগ করেন এবং সার্বিয়া-বুলগেরিয়া যুদ্ধের সময় বিভিন্ন কূটনৈতিক দৌত্যের কাজে স্বল্পকালের জন্য দুবার কনস্টান্টিনোপল প্রেরণ করেন। এদিকে ১৮৭৮[5] সালে রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক আক্রান্ত হলে মিসর তুরস্ককে সাহায্য করে। উসমানী খলিফার সাহায্যার্থে কবি মিসরীয় বাহিনীর

সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন। এই লড়াইতে তিনি চরম বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেন। ফলস্বরূপ তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল (Brigadier General, اللواء) পদে উন্নীত হন ও বিভিন্ন পদক দ্বারা সম্মানিত হন।[1] এবারেও যুদ্ধের ঘটনাবলীকে তিনি নিপুণভাবে কবিতার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। বলকানের এই যুদ্ধ শেষে বীরের বেশে দেশে ফিরে আসলে ১৮৭৮ সালে তাঁকে প্রথমে শারকিয়্যা (محافظة الشرقية) প্রদেশের গভর্নর (مدير), অতঃপর রাজধানী কায়রোর গভর্নর হিসাবে (محافظ) নিয়োগ করা হয়।

ইসমা'ঈল পাশার পর তাঁর পুত্র খেদিভ তাওফীক মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করলে (১৮৭৯-১৮৯২),তিনি কবিকে ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। বারূদী ওয়াক্ফের বহু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে তা থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা মসজিদ, মাদ্রাসা, আবাসন নির্মাণসহ নানান জনকল্যাণকর কাজ করেন। অতঃপর ১৮৮১ সালে ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর (وزير الحربية) দায়িত্বও যৌথভাবে পালন করেন।[2] সর্বোপরি, ১৮৮২ সালের ৪ ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মন্ত্রীসভায় উরাবী পাশা 'যুদ্ধ মন্ত্রী' (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) ছিলেন।[3]

শ্রীলংকায় নির্বাসনঃ

১৮৮২ সালে উরাবী পাশার (أحمد عرابي) নেতৃত্বে মিসরীয় সেনা তুর্কী-ককেশিয়ান সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কবি মিসরীয়দের পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন।[4] এদিকে বিদ্রোহ দমনে খেদিভ তাওফীক পাশা ইংরেজ দের সাহায্য চাইলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধূর্ত ব্রিটিশরা মিসর দখল করে নেয়। ব্রিটিশ সেনা কায়রোয় প্রবেশ করে। তারা কবিকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করে। এরপর তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটি রদ করে সিংহল দ্বীপে (سرنديب) নির্বাসনের শাস্তি শোনানো হয়।[5] অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁকে শ্রীলংকায়

নির্বাসনে পাঠানো হয়। সতের বছর ও কয়েক মাসের[1] দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা তাঁকে সহ্য করতে হয়। তবে প্রবাসের বন্দী-জীবনকে অলস ভাবে না কাটিয়ে তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন।[2] এছাড়া সিংহলি মুসলিমদের আরবী ভাষা ও ইসলামের শিক্ষাও দিতে থাকেন। এর সাথে সাহিত্যানুরাগী এই সৈনিক কবি প্রাচীন যুগের নির্বাচিত কবিতা সংকলন ও কাব্য রচনার কাজও সমান তালে চালিয়ে যান।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনঃ

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ই মে খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মীর (الخديوي عباس حلمي الثاني) শাসনামলে (১৮৯২-১৯১৪) ক্ষমা ভিক্ষা লাভ করে কবি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। মিসর তার দুই বাহু প্রসারিত করে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। রাজনীতির ময়দান ত্যাগ করে সাহিত্যের জন্য তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর বাসগৃহ কবি-সাহিত্যিকদের সমাগম স্থলে পরিণত হয়।[3]

মৃত্যুঃ

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের চার বছরের মধ্যেই কবি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।[4]

রচনাবলীঃ

১। **দীওয়ান** (কাব্য গ্রন্থ) - দুখণ্ডে সমাপ্ত কবির কাব্য সংকলন। এতে প্রশস্তিমূলক কবিতা, প্রেমের কবিতা, গৌরবমূলক কবিতা, বীরত্বমূলক কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা ও সামাজিক কবিতা স্থান পেয়েছে। এটি বহুবার মুদ্রিত ও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তবে কবির জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ পায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এর বেশিরভাগ কবিতাই তিনি শ্রীলংকায় নির্বাসনে থাকাকালীন রচনা করেছিলেন। এটি প্রথমে মাহ্‌মূদুল ইমাম আল মানসূরীর ভাষ্যসহ তিন খণ্ডে কায়রোর দারুল কুতুব

প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আলী আল-জারিম ও মুহাম্মদ শফীক মারুফের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য এবং ডক্টর মুহাম্মদ হুসাইন হাইকালের (محمد حسين هيكل) দীর্ঘ ভূমিকা সহ উক্ত প্রকাশনী থেকেই প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর সমস্ত কবিতামালাকে আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২। **মুখতারাতুল বারুদী** (مُخْتَارَاتُ الْبَارُوْدِي) - আব্বাসী যুগের বিখ্যাত তিরিশ জন কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন। শ্রীলংকায় নির্বাসনে থাকাকালীন বারুদী এটি সংকলন করেন। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত এবং সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত- শিষ্টাচার, স্তুতি, শোকগাথা, বর্ণনা, প্রেম, ব্যঙ্গ ও বৈরাগ্য। উক্ত সাতটি বিষয়ে যথাক্রমে ১৬৯৭, ২৪১৮৫, ৩৪০০, ৩৩৯৩, ৪৬১৬ ও ১২২৯ টি চরণ মিলিয়ে গ্রন্থটিতে সর্বমোট ৩৯৫৯৩ টি পংক্তি রয়েছে। যে তিরিশ জন কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - বুহ্তুরী (البحتري), ইবনুর রুমী (ابن الرومي), আবুল আলা আল-মা'আর্রী(أبو العلاء المعري), মুতানাব্বী (المتنبي), আবূ তাম্মাম (أبو تمام), শরীফ রাযী (الشريف الرضي), বাশ্শার বিন বুর্দ (بشار بن برد) দের মত বিখ্যাত মুওল্লিদূন কবিগণ। ইয়াকূত আল-মুরসীর (ياقوت المرسي) প্রচেষ্টায় কবির মৃত্যুর পর গ্রন্থটির প্রথম দুটি খণ্ড ১৯০৯ সালে এবং অবশিষ্ট দুটি ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।

কাব্য-প্রতিভাঃ

আধুনিক আরবী কবিতার ইতিহাসে নবজাগরণের পথিকৃৎ বারুদী একজন কিংবদন্তি কবি। আরবী সাহিত্যের এক যুগ সন্ধিক্ষণে এই বিস্ময়কর কবি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক যুগ স্রষ্টা কবি। আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ "আব্বাসী যুগে" কবিতা তথা সাহিত্যের যে বৃক্ষটি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়েছিল, কালক্রমে (অবনতির যুগ, ১২৫৮-১৮০৫ খ্রিঃ) সেই বৃক্ষের ফুল বিবর্ণ হয়ে যায়, পাতা খসে পড়ে, শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে যায়। কবি বারুদীই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের সৃজনশীল কাব্যের সেচন দ্বারা মৃতপ্রায় এই বৃক্ষটিকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি দান করেছিলেন। তাঁর মধ্যে আরবী কবিতা নতুন করে মুতানাব্বী, বুহ্তুরী, মা'আর্রী, আবূ তাম্মামদের আত্মাকে খুঁজে পায়। তাই সার্থক ভাবেই তাঁকে **"রায়িদুশ শে'রীল হাদীস"** বা "আধুনিক কবিতার জনক" (رَائِدُ الشِّعْرِ الْحَدِيْثِ) রূপে অভিহিত করা হয়।

বারূদীর কাব্য-মনন গঠনে একাধিক উপাদান কাজ করেছিল। তাঁর ধমনীতে ছিল শাসকের শোণিতধারা। বাল্যকাল থেকেই তিনি এক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। আরবী সাহিত্যের নির্মল প্রস্রবণ থেকে তিনি তাঁর কাব্য পিপাসা নিবারণ করেছিলেন। এছাড়া ফারসী ও তুর্কী সাহিত্যও অধ্যয়ন করেছিলেন। সামরিক সূত্রে পাশ্চাত্যের জীবনও তিনি দেখেছিলেন। সর্বোপরি তদানীন্তন মিসরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় অবস্থা তাঁর কাব্য মনন বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বারূদীর কাব্যগ্রন্থ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দর্পণ। সামরিক জীবনে তিনি যে সমস্ত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কলমের নিপুণ টানে তিনি সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রণাঙ্গনের চিত্রায়ন, যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশের প্রাকৃতিক বর্ণনা, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদিকে তিনি জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি যেমন ছিলেন এক নির্ভীক ও অকুতোভয় সৈনিক, কলমের ময়দানেও তেমন ছিলেন এক সৃজনশীল ও সফল কবি। এককথায় অসি ও মসি- উভয় ময়দানেই তিনি সমান পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। এই কারণেই তাঁকে **"রাব্বুস সাইফ ওয়াল কলম"** (رَبُّ السَّيْفِ وَالْقَلَمِ, *Master of the Sword and the Pen*) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[1]

প্রবাসের দীর্ঘ নির্বাসন-জীবনে তাঁকে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। শ্রীলংকায় থাকাকালেই তাঁর স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছায়। মিসরে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও মৃত্যু হয়। এই সব কারণে কবি মানসিকভাবে দারুণ ভেঙে পড়েন। এদের শোকগাথায় রচনা করেন একাধিক মর্মস্পর্শী কবিতা। কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতে বসে তিনি তাঁর যৌবনকালকে স্মরণ করে রচনা করেন কালজয়ী কবিতাসমূহ। বস্তুত তাঁর দীওয়ানের অধিকাংশ কবিতাই প্রবাসের নির্বাসন জীবনে রচিত।

কবি বারূদীর রচনাশৈলী সহজ-সরল, প্রাঞ্জল। অলঙ্কারশাস্ত্রের বোঝা লাঘব করে তিনি আরবী কবিতাকে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছিলেন। যা প্রাচীন কবিদের কাব্য-শৈলীকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানও করেনি আবার স্থবিরতার শৃঙ্খলে আবদ্ধও